বর্ষাকালীন পরিকল্পনাঃ ভারতবর্ষের নিমজ্জমান শহরগুলির ভবিষ্যৎ

দেবযানী ভট্টাচার্য

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০

২০২০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গাঙ্গেয় বদ্বীপের উপর দিয়ে বয়ে যায় এক অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় যা এখন প্রায় বার্ষিক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এই ঝড়ের ফলে সুন্দরবনের বাঁধে ভাঙন ধরে ও কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলে ডুবে যায়। কংক্রিটে তৈরি এই শহর ঠিক কতটা গভীরভাবে বদ্বীপের ইকোলজি বা পরিবেশ এবং স্থানীয় হাইড্রোলজি বা জলবিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত তা এই ঝড়ের সহগামী বাতাস ও জলস্রোত খুব আশ্চর্যজনকভাবে সামনে এনে দিয়েছে। কলকাতার পথ ও রাজপথ ডুবিয়ে দিয়ে এই জলরাশি কলকাতা পৌরাঞ্চল ও মোহনাস্থিত সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে মানুষের হাতে আঁকা যে প্রশাসনিক সীমানা তাকে মুছে দেয়। আমাদের নগর পরিকল্পনা, অরণ্যপালনবিদ্যা ও সমুদ্রবিজ্ঞানের মত জ্ঞানচর্চার বিষয় শহর, নদী, সেচ ও বনপালন বিষয়ক প্রশাসনিক বিভাগগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। তা সত্ত্বেও, কলকাতা তার কংক্রিটের বিলাসবহুল আবাসন ক্রমে বাড়িয়ে নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আরও পুবের দিকে এবং তার ফলে বঙ্গোপসাগরের ক্রমশ উষ্ণ হতে থাকা জলরাশি নাগরিক বারিমন্ডলের সঙ্গে এই পাললিক উপকূল এলাকার খাঁড়ি ও জঙ্গলকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করছে।

আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ের ঠিক পরেই পূর্বতন ওয়েটল্যান্ডের উপর নির্মিত কলকাতা বিমানবন্দরের জলমগ্ন হ্যাঙ্গারে অর্ধেক ডুবে থাকা বিমানের ছবি আমরা অনেকেই ঘুম থেকে উঠে দেখেছি। আমরা দেখেছি রাস্তায় তোড়ে ছুটে চলা জলের মধ্যে কীভাবে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বইবাজার উত্তর কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের রাশি রাশি বই ভেসে চলেছে। সামান্য সময়ের জন্য হলেও গাঙ্গেয় বদ্বীপ এই শহরকে মনে করিয়ে দিয়েছিল যে সে ভুলে গেলেও তার উদ্ভব হয়েছে জলের থেকে। ইতিমধ্যে, বাড়তে থাকা দূষণ ও কার্বন নিঃসরণ বর্ষাকালের স্থিতি নষ্ট করে দিচ্ছে, যার ফলে ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর শেষ পর্যন্ত বর্ষা শুরুর দিন সংশোধন করতে বাধ্য হয়েছে। তাই, ভারত মহাসাগরের জলরাশির বাড়তে থাকা উষ্ণতার সমাধান খুঁজতে ও ক্রান্তীয় বর্ষামণ্ডলের সুস্থিতির কথা মাথায় রেখে ভারতীয় শহরগুলির অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অনুসন্ধান করা আশু প্রয়োজন।

এই কাহিনি শুধু কলকাতার নয়। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারতের উত্তর পশ্চিমের শুষ্কতর অংশে ভারি বর্ষণের ফলে জয়পুরের মত শহর বন্যা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে আর গুরুগ্রামের রাস্তা জলে ডুবে গিয়েছে। এদিকে আরব সাগর এগিয়ে এসে ক্রমে মুম্বাই-এর কিছুটা করে অংশ দখল করে নিচ্ছে, এটাই এখন আমাদের নব্য-স্বাভাবিকতা। জলসমস্যার কারণে চেন্নাই যে উভয়সংকটে পড়েছে তা যেন জেনাসের দুই মুখ। জলাভূমি বুজিয়ে বাড়ি বানানোর পরিণতি কী হতে পারে তা ২০১৫ সালের বন্যার পর থেকেই বোঝা গিয়েছে। ২০১৫-য় অতিরিক্ত বন্যার জলে আচ্ছন্ন চেন্নাই ২০১৯-এর মধ্যে 'ডে জিরো' ছুঁয়ে ফেলে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে শহরের জলের সঞ্চয় সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গিয়েছে। অ্যাক্টিভিস্ট ও স্কলার নিত্যানন্দ জয়ারামন চেন্নাই-এর জলসংকটের কারণ নিয়ে আলোচনা করার সময় উল্লেখ করেছেন যে এই সংকট তৈরি হয়েছে এই শহরের সঙ্গে তার জলভাগের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে। একই কথা বলা যায় কলকাতা আর মুম্বাই সম্পর্কেও। এই দুই শহরেই নদী, সমুদ্র, জলাভূমি এবং পয়ঃপ্রণালীর বাড়তে থাকা জলরাশি ধীরে ধীরে রাস্তা আর ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ছে। এ সবই গত দেড়শ বছর ধরে জলবায়ু বিষয়ক বিভিন্ন আইনি পদক্ষেপ নেওয়া এবং নগর পরিকল্পনার নানা সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত না করে ফেলে রাখার পরিণাম। কলকাতার নগরায়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে হয়ত নতুন জলের সঞ্চয় তৈরির বিষয়ে কিছু সতর্কতামূলক সমাধান পাওয়া যাবে। শুধু জলবাহী পাইপের পরিকাঠামো নয়, মাথার উপরের মেঘ এবং ভূপৃষ্ঠের ঠিক নিচের মাটির স্তর, আমাদের শহর ঘিরে থাকা সরোবর, ছোট জলাশয়, জলাভূমি – এই সবই শহরের জলের পরিস্থিতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের শহরগুলির জলবাহী পাইপের পরিকাঠামোর উপর অনেকটাই মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে যেহেতু পানীয় জলের অধিকার এখনও বর্ণ ও শ্রেনিপরিচয়ের উপর নির্ভরশীল এবং সেই অনুযায়ী বিভাজিত। তবে, ডোবা, জলাভূমি, নালা এবং মেঘের মত জলের অন্যান্য উৎস মূলধারার আলোচনা প্রবাহ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। অথচ, ঐতিহাসিকভাবে, এই ধরনের জলরাশি উনবিংশ শতকের ঔপনিবেশিক নগরগুলির একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্মাণে বিষবাষ্প আর মহামারীর আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঔপনিবেশিক কলকাতায় এপিডেমিওলজি বা মহামারী বিদ্যার একটি ধারণা অনুযায়ী এলাকার "জলবায়ু" ছিল যাবতীয় রোগের উৎস এবং তার ফলে উনবিংশ শতক থেকেই এই শহরের জলাভূমি, খাঁড়ি, খাল আর নালির জলনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রচলন হয়। এরই ফলশ্রুতি রানাল্ড মার্টিনের ১৮৩৬ সালের বিখ্যাত প্রতিবেদন *নোটস অন দা*

মেডিক্যাল টোপোগ্রাফি অফ ক্যালকাটা যা ছিল জ্বরবহুল অঞ্চলের মানচিত্র ও শহরের জলনিষ্কাশনের পরিকল্পনায় ভরা একটি দলিল। তবে, একটি আদর্শ শহর কেমন হওয়া উচিত এই প্রতিবেদনটি তার বর্ণনা হিসেবেই রয়ে গিয়েছে, এর কোনও বাস্তব রূপায়ন ঘটেনি। অন্যান্য যে কোনো প্রশাসনিক নথির ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে তেমনি এই প্রতিবেদনটির নানা অংশ যে শহরের রাস্তাঘাট বর্ষাকালে নিয়মিতভাবে জলে ডুবে থাকত সেই কলকাতার ভবিষ্যৎ নিয়ে বহু রচনায় উদ্ধৃত, শব্দান্তরিত আর উল্লিখিত হয়েছে এবং অসংখ্য লেখক এই প্রতিবেদনের অংশবিশেষকে নিজের লেখা বলে চালিয়েছেন। তার মানে এই নয় যে, নগরের একটা বড় অংশের জলনিষ্কাশন হত না। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কলকাতার এবং তার আশেপাশের জলাভূমিগুলিকে উদ্ধার করে সেগুলিকে লাভজনক ভূসম্পত্তিতে পরিণত করা হয় এবং বিভিন্ন জমির স্বত্বাধিকারী সংস্থার অধিকারে নিয়ে আসা হয়। বিষবাষ্পজনিত জ্বরের ভয় যে এই ধরনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে খুব বড় প্রভাব ফেলেছিল তা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কলকাতার পশ্চিমে হুগলি নদীর বিসর্পিল গতিপথের কাদায় ভরা জমির দীর্ঘ অংশ বা পূর্বের নোনা জলাভূমির মত যে সমস্ত জায়গায় জল এবং জমির মেলবন্ধন ঘটেছিল সেগুলি সবই স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয় আর সেইসব সম্পত্তি এই ক্রমশ ছড়াতে থাকা শহরের জমি-বাড়ির লাভজনক ব্যবসায় কাজে লাগে। এই মুনাফাকেন্দ্রিক সম্পত্তি সংক্রান্ত ভাবনাই কলকাতা শহরের এই সমস্ত কাদাভরা জলাজমিকে হস্তান্তরযোগ্য ভূসম্পত্তিতে পরিণত করে যাকে এই ক্রমঃবর্ধমান জমির বাজারে খুব সহজে দেওয়া নেওয়া করা যায়।

১৮২০-র দশকে প্রথম যখন আইনকানুন মেনে ব্যক্তিগত মালিকানার জমিকে সাধারণের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করার পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয় তখন এই কাজে নোনা জলাভূমি আর হুগলি নদীর পাললিক জমি ব্যবহার করা হত। পাললিক ভূমির উপর তৈরি প্রধান সংযোগকারী রাস্তা স্ট্র্যান্ড রোডের মত সাধারণের ব্যবহারের রাস্তা তৈরির উদ্দেশ্যে জলাভূমির মালিকানার আইনসম্মত অধিগ্রহণ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। তার কারণ মুনাফা তৈরির এই নতুন অঙ্কে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মালিকানায় থাকা খাল আর নালা যা এই শহরে জালের মত ছড়িয়ে ছিল সেগুলি প্রথমে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর পরে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, কলকাতার ব্রিটিশ রাজের অধীনে চলে আসে।

বিংশ শতাব্দী নাগাদ পুকুর, জলা এবং খালকে একাধিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার নীতি বন্ধ হয়ে যায় এবং জলাভূমিকে কলকাতার নগরায়নের পথের বাধা হিসেবে দেখা শুরু হয়। রেঙ্গুন ও মুম্বাই-এর মতই, কলকাতাতেও শ্রমজীবী শ্রেণির সক্রিয় রাজনৈতিক আবহ এবং থাকার জায়গা নিয়ে তুমুল সমস্যা ছিল। বিশের দশকে পৌরসভার নানা উত্তপ্ত বিতর্কে স্থির হয়, যিনি জলাভূমিকে বাসযোগ্য স্থানে পরিণত করেন তিনিই আদর্শ জমি মালিক। এই ভাবেই তৈরি হয় জমি উন্নয়নকারী শ্রেণির, পরে যারা নাগরিক রাজনীতিতে মুখ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে উঠে আসে। বাস্তবিকই, বাসস্থান বিকাশের থেকে প্রাপ্য মুনাফার বিপরীতে অলাভজনক "পতিত" জলাভূমিকে দাঁড় করানোই ছিল ১৯৫০ সালে নোনাভূমি থেকে ব্যাপকহারে জলনিষ্কাশন করে কলকাতার ধনীদের বসবাসের জন্য সল্ট লেক অঞ্চল তৈরি করার প্রেরণা। কলকাতার পূর্বপ্রান্তের ওয়েটল্যান্ডগুলিকে বসবাসযোগ্য জমিতে পরিণত করে জলাজমির উপর আবাসন বানিয়ে একধরনের ভবিষ্যৎমুখী প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে এই ধরনের বিকাশ এখনও বিনা বাধায় চলছে। বিংশ শতকের বোম্বেতেও এই একই ধাঁচা দেখতে পাওয়া যায় যখন সমুদ্রগর্ভ থেকে জমি পুনরুদ্ধার করে নগরায়নের ফলে সমুদ্র পরিণত হয় অসম্ভব মুনাফাদার ভূসম্পত্তিতে।

তাই সমসাময়িক কলকাতায় নিয়মিত বন্যা পরিস্থিতি বা ২০৫০ সালের মধ্যে মুম্বাই-এর অংশবিশেষ যে জলের তলায় ডুবে যাবে বলে ঘোষণা করা হচ্ছে তা আশ্চর্যের কিছু নয় এবং গত একশ বছর ধরেই এর প্রস্তুতি চলছে। শুধুমাত্র সঠিক পরিকল্পনার অভাবই এই ধরনের সংকটের কারণ এ কথা সহজেই বলে ফেলা যায়। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াকে সঠিক বলা যায় না। বরং এই পরিস্থিতি একটা বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর ফলাফল, যার কাছে জলাভূমিগুলি নেহাতই অলাভজনক বর্জ্যভূমি এবং যে দৃষ্টিভঙ্গী মুনাফার জন্য সমস্ত জলবাহী খাঁড়ি ও নালা মুছে দিয়ে জলাজমিকে লাভজনক আবাসনে পরিণত করে। জয়ারামনের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলা যেতে পারে যে প্রতিটি শহরের সঙ্গে তার জলের সম্পর্ক ভেঙে পড়েছে, নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সে জল আকাশ ভেঙে নামতে পারে, মাটি থেকে চুঁইয়ে উঠে আসতে পারে বা শহর ঘিরে থাকা সাগর আর উপসাগর থেকে ধীরে ধীরে বয়ে চলে আসতে পারে। প্রশ্ন হল, বারিমন্ডলকে আমরা নগরের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার অংশ হিসেবে দেখব, নাকি দেখব না এবং খুঁজে দেখব কিনা ঠিক কোথায় জলপ্রবাহের সীমানাকে মুছে দেওয়া হয়েছে, থামিয়ে দেওয়া হয়েছে আর অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে। আমরা কি আমাদের জলবাহী পাইপে, মাটির নিচের স্তরে, জলাধারে, সমুদ্রে, মেঘে যে জল আছে, যে জল সান্দ্র আর উভচর রূপে জলাভূমি আর ওয়েটল্যান্ডে আছে তাকে ভারতবর্ষের নাগরিক ভূখন্ডের ভবিষ্যতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখতে সক্ষম হব?

দেবযানী ভট্টাচার্য ড্রেক্সেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হিস্ট্রি অ্যান্ড আরবান স্টাডিজের অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক এবং CASI নন-রেসিডেন্ট ভিজিটিং স্কলার।